সন্ত্রাসী গালিব কাহিনী

জঙ্গি অস্তিত্ব স্বীকার তারপর...

গোলাম মোর্তোজা

'গোঁড়া'- শব্দটি পরিচিত। প্রায় প্রতিটি সমাজে এমন কিছু মানুষ থাকেন যারা যুক্তি-তর্কে বিশ্বাস করেন না। তারা পূর্ব নির্ধারিত বিষয় অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে পছন্দ করেন। মতের সঙ্গে মিলে না এমন যেকোনো কিছুর বিরুদ্ধে থাকে তাদের অবস্থান। পৃথিবী একদিকে, তারা অন্যদিকে। এই একগুঁয়ে গোঁড়া মানুষগুলোর জন্যে সমাজ নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা আসেন তারা কোনো রকম সময় নষ্ট না করে গোঁড়ামি নীতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন। অটল অবিনশ্বর থাকে তাদের সেই বিশ্বাস। সারা দেশের মানুষ যা কিছুই বলুক না কেন, সেটা ক্ষমতাসীনদের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। চোখে থাকে কালো চশমা, কান থাকে 'সীলগালা'। তবে খোলা থাকে মুখ। কথা বলে চলেন অনর্গল...। যার অধিকাংশই অর্থহীন এবং অসত্য। তাদের কথায় থাকে না কোনো যুক্তি। কথা দিয়ে পাহাড় ঠেলে সরাতে চান।

বাংলাদেশে কিছু রাজনৈতিক দল আছেন যারা নামের আগে 'ইসলামী' শব্দটি লাগিয়ে নিয়েছেন, নিজেদের সুবিধার জন্যে। এদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান, ধর্মপ্রাণ। 'ইসলামী' নাম নিয়ে তাদের রাজনীতির নামে ব্যবসা করতে সুবিধা হয়। এই ধর্ম ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন নামে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে দীর্ঘদিন ধরে। আজ থেকে আট দশ বছর আগেও ভাবা হতো এরা কোনোদিন বাংলাদেশে শক্তিশালী হতে পারবে না। কারণ '৭১-এ তাদের অপকর্ম মানুষ দেখেছে। '৭১-এর পরাজিত অপশক্তি স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের মনে স্থান পাবে না, সেটাই স্বাভাবিক। রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট তারা এই ধর্মব্যবসায়ীদের প্রশ্রয় দেবে না। অথবা ধর্মব্যবসায়ীরা রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে অপতৎপরতা চালাতে পারবে না। কিন্তু সব কিছুকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়ে ধর্মব্যবসায়ীদের একটি অংশ চলে এসেছে রাষ্ট্রক্ষমতায়। ক্ষমতায় এসে পুরো রাষ্ট্র ব্যবস্থাটাকে 'একগুয়েমি নীতি'তে সাজিয়েছে। নির্লজ্জভাবে রাষ্ট্রক্ষমতার সাপোর্ট তাদের পক্ষে। যদিও ধর্মব্যবসায়ীদের এটা প্রকাশ্য রূপ। গোপনে এদের রূপ যে কতোটা ভয়ঙ্কর সেটা এতোদিন পর্যন্ত ছিল অনুমান-নির্ভর। তথ্য প্রমাণ দেয়ার পরও অনেকে বিশ্বাস করতে চাইছিল না। যার কিছুটা বাংলাদেশের মানুষ এখন বুঝতে পারছে। সাম্প্রতিক সময়ে তাদের কিছু কর্মকান্ড মানুষকে বুঝতে সাহায্য করেছে। মানুষ বুঝতে পারলেও বুঝতে চাইছিল না সরকার। তারা ইসলামী জঙ্গি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ওঠা সব রকম অভিযোগ অস্বীকার করে আসছিল। গোঁড়া'রা যা করে ঠিক সেভাবে। সরকার একনাগাড়ে বলে আসছিল বাংলাদেশে কোনো জঙ্গি সংগঠন নেই। নেই তাদের কোনো অপতৎপরতা। পত্র-পত্রিকার রিপোর্টকে বলছিল মিথ্যা, এমন কী ছবিকেও। সেই সরকার আকস্মিকভাবে অষ্টম আশ্চর্যের জন্ম দিল। নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো দু'টি দলকে। গ্রেপ্তার করলো ইসলামী জঙ্গি সন্ত্রাসী নেতা ড.

সাফল্য আছে উৎপাদনে। সেটা করেছে কৃষক। নীরবে বিপ্লব করে চলেছে তারা। হরতাল-ধর্মঘট কোনোদিন তাদের স্পর্শ করেনি। তাদের কোনো সরকারি ছুটিও নেই। কাজ করেন প্রতিদিন। তারা পাশে কোনোদিন কোনো অর্থমন্ত্রী বা সরকারকে পান না। কৃষকের পেছনে সময় দেয়ার মতো সময় তাদের থাকে না

গালিবকে। সরকার স্বীকার করে নিল তার পূর্বের বক্তব্য সত্য ছিল না। স্বীকার করে নিল বাংলাদেশে জঙ্গি সন্ত্রাসী সংগঠন আছে, আছে তাদের অপতৎপরতা। তাদের অমানবিক কর্মকান্ডে বাংলাদেশ ক্ষতবিক্ষত।

সরকারিভাবে এখন আর বলার সুযোগ রইলো না যে, বাংলাদেশে জঙ্গি সংগঠনের অস্তিত্ব নেই। পরবর্তী যেকোনো গ্রেনেড-বোমা, দুর্ঘটনার সঙ্গে আলোচিত হবে ইসলামী জঙ্গি সন্ত্রাসীদের প্রসঙ্গ। তখন সরকার আর ভাঙা রেকর্ডারে 'না' সংগীত বাজাতে পারবে না। সরকারের ভেতরের জঙ্গি মৌলবাদী অংশ ইসলামী ঐক্যজোটের আজিজুল-আমিনীরা বলতে চাইছে এতে দেশের ক্ষতি হলো। বাংলাদেশকে এখন বিদেশীরা জঙ্গি ইসলামী রাষ্ট্র বলবে। এ যুক্তিতে সরকারের ওপর তারা চাপ সৃষ্টি করছে। সরকার যাতে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নেয়, সেটা নিয়ে চলছে জোর তৎপরতা। সরকারের অংশীদার জামায়াত-শিবিরের কিছু জঙ্গি সন্ত্রাসী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে। রংপুরে গ্রেপ্তার হওয়া দুই শিবির জঙ্গি 'শিবির নয়' এটা প্রমাণের চেষ্টা চলছে। অন্য যেসব জঙ্গিরা গ্রেপ্তার হয়েছে স্বীকারোক্তিতে প্রায় সবাই বলেছে কোনো না কোনোভাবে তারা জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে জড়িত ছিল।

গ্রেপ্তারকৃত জঙ্গি নেতা গালিবের সঙ্গে জামায়াতের ছিল চমৎকার সম্পর্ক। জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর ঘনিষ্ঠ ছিল জঙ্গি গালিব। এ বিষয়গুলো রাখঢাকের চেষ্টা চলছে। চেষ্টা চলছে সব কিছু ধামাচাপা দিয়ে দেয়ার। এ কারণে জঙ্গি গালিবকে গ্রেপ্তার করার পর কী করা হবে সেটা নিয়ে প্রশাসন বেশ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল বলেই মনে হয়েছে। পুলিশের প্রতি সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা ছিল না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেসনোটে বাংলা ভাইয়ের 'জাগ্রত মুসলিম জনতা' এবং গালিবের 'জামাআতুল মুজাহিদিন' নামক সংগঠন দু'টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে সন্ত্রাসী জঙ্গি কর্মকান্ডের জন্যে। প্রেসনোটের ভাষ্য অনুযায়ী এ যাবৎকালের সবগুলো গ্রেনেড-বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে এ দু'টি সংগঠনের সম্পৃক্ততা ছিল বলে প্রমাণ হয়। অথচ গালিবকে গ্রেপ্তার করার প্রথম দুদিন তার নামে কোনো মামলা দায়ের করা হয়নি। গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে ৫৪ ধারায়। কোনো রকম জিজ্ঞাসাবাদ না করে আদরের সঙ্গে জেলে রাখা হয় তাকে। পত্রপত্রিকার সমালোচনার কারণেই গালিবকে ঢাকায় আনা হয়েছে, করা হচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদ। যদিও গালিবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছে। তারপরও মনে হচ্ছে সরকার সিদ্ধান্ত নিতে কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত। দেশবিরোধী জঙ্গি তৎপরতার এতো বড় অভিযোগ ওঠার পরেও সিদ্ধান্ত নিতে সরকারের এই দ্বিধার কারণ কী? কারণ সরকারের অংশীদার জামায়াত এবং ইসলামী ঐক্যজোট চাইছে না- জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সত্যিকার কোনো ব্যবস্থা নেয়া হোক।

সারা দেশের মানুষ যা কিছুই বলুক না কেন, সেটা ক্ষমতাসীনদের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। চোখে থাকে কালো চশমা, কান থাকে 'সীলগালা'। তবে খোলা থাকে মুখ। কথা বলে চলেন অনর্গল...। যার অধিকাংশই অর্থহীন এবং অসত্য। তাদের কথায় থাকে না কোনো যুক্তি। কথা দিয়ে পাহাড় ঠেলে সরাতে চান

জঙ্গি গালিব

জামাআতুল মুজাহিদিনের আমীর ড. আসাদুল্লাহ আল গালিবের জন্মস্থান সাতক্ষীরার বাকাল থানার বুলারাটি গ্রামে। সাতক্ষীরা শহর থেকে দক্ষিণে কালীগঞ্জ সড়ক ধরে যেতে দুই-আড়াই কিলোমিটার দূরে গালিবের বাড়ি। তার বাবার নাম মৌলভী আহম্মেদ আলী। বড় ভাই ছিল বেশ নামকরা রাজাকার। 'পিস কমিটি'র জেলা সভাপতি ছিল সে। গালিব বিগত তের-চৌদ্দ বছরে সাতক্ষীরা জেলা সদর, বাকাল, দেবহাটা ও আশাসুনী এলাকায় ৫০টিরও অধিক মসজিদ তৈরি করেছেন। স্থানীয় দিবানৈশ কলেজের অধ্যক্ষ জানান, মসজিদগুলোর অবকাঠামো প্রচলিত অবকাঠামো থেকে আলাদা। মসজিদগুলো কুয়েত ও কাতারের অর্থায়নে তৈরি। '৯০-এর দিকে গালিব এলাকায় একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির চেষ্টা করে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়ন নিয়ে কুয়েতের সঙ্গে ঝামেলা হয় এবং ওই ঝামেলা থানা ও আদালত পর্যন্ত গড়ায়। সম্ভবত এখনো এ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটা মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

গত ৭-৮ মাস আগে গালিব সাতক্ষীরা সদরের শহীদ আব্দুর রাজ্জাক পার্কে মিটিং করে। মিটিংয়ে সে কুফরি শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ, বিভিন্ন অনৈসলামিক শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ এবং বিভিন্ন অনৈসলামিক কার্যকলাপ প্রতিহত করার আহ্বান জানান। 'অনৈসলামিক কার্যকলাপ' বলতে ড. গালিব আহলে হাদিস মতাদর্শের বাইরের আদর্শকেই বুঝিয়েছিলো।

স্থানীয় কলেজের অপর শিক্ষক রবিউল ইসলাম জানান, ড. গালিব সাতক্ষীরা এলাকায় পরিচিত পায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার পর। সে শিক্ষক হওয়ার পর থেকেই স্থানীয় শিক্ষার্থীদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রলোভন দেখিয়ে নিজের কাছে ভেড়াতো এবং অনেককে অবৈধভাবে ভর্তিও করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এছাড়াও কলেজ শিক্ষক রবিউল জানান, বাকালে ড. গালিব যে বিশাল মসজিদ তৈরি করেছে সেটা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ আছে। বাকালের স্থানীয়রা ওই মসজিদ নিয়ে গালিবের বিরুদ্ধে মিছিল পর্যন্ত করেছে। স্থানীয়রা অভিযোগ করে ড. গালিব মসজিদের নামে ১০ লাখ টাকা কুয়েত থেকে এনে মাত্র ৫ লাখ টাকায় কাজ সম্পাদন করে। আর বাকি টাকা সে আত্মসাৎ করে। স্থানীয়দের ওই অভিযোগ পরবর্তীতে প্রমাণ হওয়ায় ড. গালিব আত্মসাৎকৃত ঢাকা ফেরত দেয়।

গালিব স্থানীয় মাদ্রাসা থেকে কামিল পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে ভর্তি হয়। ১৯৭৮ সালে সেখান থেকে পাস করে। ১৯৮০ সালে গালিব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়। জঙ্গি গালিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে আহলে হাদিস আন্দোলন নামের একটি সংগঠন গড়ে তোলে। বর্তমানে গালিব নিজেকে আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের একাংশের আমির দাবি করে।

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে ধর্ম প্রচারের কথা বলে টাকা এনে গড়ে তুলেছে মসজিদ, মাদ্রাসা। সাতক্ষীরা জেলার প্রায় ৫০টি

জঙ্গি গালিব গ্রেপ্তার এবং সংগঠন নিষিদ্ধ করার সঙ্গে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত দাতাগোষ্ঠীর বৈঠকের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ না জানিয়ে বাংলাদেশকে নিয়ে মিটিং করেছে দাতারা। জোট সরকার এবং বাংলাদেশের জন্যে যা খুবই লজ্জাজনক। এটা ছিল আসলে সরকারের প্রতি দাতাদের প্রকাশ্য হুমকি। ভবিষ্যতের ভয়ে ভীত হয়েই সরকার হঠাৎ করে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে ফেলে। ব্যবস্থা নেয়ার আগে জানানো হয়নি সরকারের অংশীদার মৌলবাদীদের। তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকার আপাতত দাতাদের আশ্বস্ত করতে পেরেছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিষয়টি কী হবে? ঘটনার কী এখানেই সমাপ্তি ঘটবে? নাকি জঙ্গি মৌলবাদ উচ্ছেদের কার্যকর ব্যবস্থা নেবে সরকার? যদি নেয় তাহলে সেটা দেশের জন্যে মঙ্গলজনক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেভাবে পাকিস্তানের ইমেজ অনেকটা ফিরিয়ে এনেছেন পারভেজ মোশাররফ। পারভেজ মোশাররফের মতো ব্যবস্থা নিতে হলে সরকারকে অসম্ভব কঠোর হতে হবে। আমরা আশা করতে চাই যে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে। আমরা এটা বিশ্বাস করতে চাই না যে সরকারের এখন পর্যন্ত নেয়া উদ্যোগ কোনো 'আইওয়াশে'র অংশ। এটা বিশ্বাস করতে পারলে দেশবাসী খুশি হবেন যে, কোনো বিদেশী প্রভুকে খুশি করার জন্যে ব্যবস্থা নেয়নি সরকার। দেশের স্বার্থে, দেশের মানুষের স্বার্থে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছে সরকার।

এ কথা সরকারের মনে রাখতে হবে যে কয়েকজন জঙ্গি বা একজন গালিবকে গ্রেপ্তার করাটাই শেষ কথা নয়। জামায়াতের সঙ্গে জঙ্গিদের সম্পর্কের বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। সাঈদীদের দায়-দায়িত্বহীন বক্তব্য এবং 'যা ইচ্ছে তাই করার' গোঁড়া আচরণ বন্ধের উদ্যোগ নিতে হবে। মুফতি আমিনীদের হুঙ্কারে সরকারের ভীত হয়ে যাওয়ার মানসিকতা ত্যাগ করা প্রয়োজন। খালি কলসির আওয়াজ বেশি হয় এবং অল্পতেই ভেঙে পড়ে। আমিনীরা হচ্ছে জনসম্পৃক্ততাহীন একেকটি খালি কলসি। এদের যত আস্কারা দেয়া যায় তত তারা পেয়ে বসে। ইতিমধ্যে বিএনপি তাদেরকে অনেকটা পেয়ে বসার সুযোগ করে দিয়েছে। তাদের দ্বারা অনেকটা ব্যবহৃত হয়েছে বিএনপি। এই ধারা অব্যাহত থাকলে বিএনপির জন্য বিপদ তো বটেই, দেশের অস্তিত্বের জন্যও হুমকি।

যদিও গালিবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছে। তারপরও মনে হচ্ছে সরকার সিদ্ধান্ত নিতে কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত। দেশবিরোধী জঙ্গি তৎপরতার এতো বড় অভিযোগ ওঠার পরেও সিদ্ধান্ত নিতে সরকারের এই দ্বিধার কারণ কী? কারণ সরকারের অংশীদার জামায়াত এবং ইসলামী ঐক্যজোট চাইছে না- জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সত্যিকার কোনো ব্যবস্থা নেয়া হোক

জঙ্গি গালিবকে দশ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে যৌথ দল। সরকারের এই পরিবর্তিত নীতিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। কিন্তু দ্বিধাহীন হতে পারি না। এখনো বাংলা ভাইয়ের নামে কোনো মামলা হয়নি। পুলিশ বলছে বাংলা ভাই সর্বহারাবিরোধী অভিযান শুরু করেছিল। জঙ্গি বা সন্ত্রাসী বলছে না। যদিও সরকারি প্রেক্ষাপটের ভাষায় সে জঙ্গি সন্ত্রাসী। সরকার এবং পুলিশের এই স্ববিরোধী আচরণের অর্থ কী?

বাংলাদেশের মানুষ যে ধর্মব্যবসায়ী মাদ্রাসায় তার কর্মকান্ড বিস্তৃত। এই মাদ্রাসাগুলোয় মূলত রাতের বেলায় সশস্ত্র ট্রেনিং দেয়া হয়। বোমা বানানোর কাঁচামাল এবং অস্ত্রের যোগান আসে ভারত থেকে। সাতক্ষীরা সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে সবকিছু চলে আসে। সাতক্ষীরা সদর উপজেলার বাকাল, আলীপুর এবং কলারোয়া উপজেলার কাকডাঙ্গা আহলে হাদিস মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করেই জঙ্গিদের মূল তৎপরতা পরিচালিত হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জঙ্গিরা এই মাদ্রাসাগুলোতে আশ্রয় নেয় বলে জানা যায়। শামসুর রাহমান হত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িতরাও গালিবের মাদ্রাসাগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল বলে জানা যায়। ধারণা করা হয়, ড. হুমায়ুন আজাদের ওপর আক্রামণকারীরাও গালিবের অনুসারী। জঙ্গি গালিবের অর্থের মূল উৎস ঢাকার 'ইসলামিক রিভাইভাল হেরিটেজ অব কুয়েত'। এ ছাড়া 'হায়াতুল ইগাছা' নামের সৌদি সংগঠনটির কাছ থেকেও গালিব নিয়মিত অর্থ পেয়ে থাকে।

গাজীপুর চৌরাস্তার পাশে ১২ বিঘা জমির ওপর বিশাল মাদ্রাসা তৈরি করেছে গালিব।

জঙ্গি গালিবের বিরুদ্ধে অর্থ এবং সম্পদ দখলের অভিযোগও রয়েছে। বগুড়া, রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে 'তাওহিদ ট্রাস্টে'র কয়েক কোটি টাকার সম্পদ দখল করে রেখেছে গালিব। এ অভিযোগ করেছে তাওহিদ ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ।

গালিব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। কিন্তু সে ১৯৯৮ সালে ভারতে যায় ব্যবসায়ী পরিচয়ে। ভারতের কিছু জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সেই সময় তার আলোচনা হয়। তারপর গালিব তার কিছু জঙ্গিকে ভারতে পাঠায় প্রশিক্ষণের জন্য।

ভারত থেকে ফিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার পর তার ব্যবসায়ী পরিচয়ে দেশের বাইরে যাওয়ার বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। সেই সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ছিলেন অধ্যাপক মুহম্মদ ইউনুস। তখন থেকেই গালিব ক্ষুব্ধ ছিলেন অধ্যাপক ইউনুসের ওপর। বিভিন্ন সময় তাকে হুমকিও দিয়েছেন। ২০০৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে অধ্যাপক ইউনুসকে। গালিবের জঙ্গিরাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবিরের মাধ্যমে এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গালিব তার কর্মকান্ড বিস্তৃত করে। সরকারের বিশেষ করে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মাধ্যমে জামায়াতের সাপোর্ট পায় গালিব। জামায়াত-শিবিরের সমর্থনেই সে তার জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি করে। সাম্প্রতিক সময়ে যাত্রা অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক অফিসে বোমা- এ সবই গালিব করেছে পরিকল্পিতভাবে। যা কিছুই ঘটুক না কেন, ক্ষমতায় থেকে জামায়াত তাকে রক্ষা করবে- এই বিশ্বাস তার ছিল। তার এই বিশ্বাসের মূলে ছিল বাংলা ভাইয়ের কর্মকান্ড। হত্যা করে লাশ গাছে ঝুলিয়ে রাখার পরও সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বাংলা ভাইয়ের বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হবে না- সেই নিশ্চয়তা তাকে দেয়া হয়েছিল বলে জানা যায়।

কাগজে-কলমে এখন জামায়াতের সঙ্গে তার সম্পর্ক না থাকলেও কর্মকান্ডে আছে। বলা যায়, তাদের কর্মকান্ড একই সূত্রে গাঁথা। ধারণা করা হয়, জামায়াত-শিবির তাদের সুবিধার জন্যই আহলে হাদিসের সাইনবোর্ড লাগিয়ে জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মৌলবাদীদের বিশ্বাস করে না, পছন্দ করে না- সেটা আর নতুন করে বলার নেই। বাংলাদেশে মৌলবাদীরা সবকিছু দখল করে নিয়েছে সেটা বলা যাবে না। এখনো প্রগতিশীল জনমানুষই শক্তিশালী। জঙ্গি মৌলবাদীরা সংখ্যায় সামান্য। কিন্তু তাদের কর্মকান্ডে মনে হয় অনেক। এর কারণ তারা সংগঠিত। সাধারণ মানুষ সংগঠিত নয়। তাই তাদের অপছন্দ করলেও মানুষ তাদের প্রতিহত করতে পারে না। প্রতিহত করার উদ্যোগ নেয়া উচিতও নয়। তাহলে আইন হাতে তুলে নেয়া হবে। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার অধিকার এবং ক্ষমতা আছে একমাত্র সরকারের। সরকার উদ্যোগী হলে সাত দিনের মধ্যে বাংলাদেশ জঙ্গি-সন্ত্রাসীমুক্ত হতে পারে। এর জন্যে সরকারকে হতে হবে আন্তরিক। সরকার আন্তরিক হয়ে উদ্যোগ নিলে সাধারণ জনমানুষের সমর্থন পাবে। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে তৎপর হলে নির্বাচনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়বে না। ভোটারদের আস্থা সরকারের ওপর বাড়বে।

প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের মন্ত্রীরা প্রায়ই বলেন, দেশের এতো উন্নয়ন হচ্ছে পত্রপত্রিকা সে কথা লেখে না। শুধু নেগেটিভ খবর প্রচার করে। তারা বলতে চান, জঙ্গি মৌলবাদ মিডিয়ার সৃষ্টি। তাদের এই অভিযোগ যে সঠিক ছিল না, সেটা তো তারাই প্রমাণ করলেন। দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীর কী ধারণা আছে? সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে যে সবকিছুর অবস্থান সেটা তারা জানেন?

এত উন্নয়ন কোথায় হচ্ছে সুনির্দিষ্ট করে বলছেন না কেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী? এটা নিশ্চিত যে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারবেন না। একটি কথাই বলতে পারবেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া শুরু হয়েছে। ক্রসফায়ারে অনেক বড় বড় সন্ত্রাসীর মৃত্যু হয়েছে। আমরাও এটা বিশ্বাস করি যে সন্ত্রাস কিছুটা কমেছে। এও বিশ্বাস করি যে, এটা স্থায়ী কোনো সমাধান নয়। ক্রসফায়ারের মাধ্যমে সন্ত্রাস সাময়িকভাবে কমানো যাবে, নির্মূল হবে না। ফলে এটা সরকারের কোনো সাফল্য নয়।

সাফল্য আছে উৎপাদনে। সেটা করেছে কৃষক। নীরবে বিপ্লব করে চলেছে তারা। হরতাল-ধর্মঘট কোনোদিন তাদের স্পর্শ করেনি। তাদের কোনো সরকারি ছুটিও নেই। কাজ করেন প্রতিদিন। তারা পাশে কোনোদিন কোনো অর্থমন্ত্রী বা সরকারকে পান না। কৃষকের পেছনে সময় দেয়ার মতো সময় তাদের থাকে না। কৃষক উৎপাদন করে একা। নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের মাধ্যমে। তার উৎপাদন আরো অনেক বাড়তে পারতো। পুরোপুরি বদলে যেতে পারতো দেশের চেহারা। যদি কৃষকের পাশে দাঁড়ানো যেত।

উৎপাদনের জন্যে অপরিহার্য সার কৃষক সময় মতো পায় না। বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ডিজেলের অত্যধিক দাম... প্রায় সবকিছুই কৃষকের প্রতিকূলে। তারপরও সে উৎপাদন অব্যাহত রাখে, সেই সাফল্য নিজেদের বলে প্রচার করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীরা। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেন যে গ্রাম উন্নয়নের কথা বলছেন সেটার কৃতিত্বও কৃষক এবং এনজিওদের। এখানেও সরকারের কোনো সাফল্য নেই।

দেশের যে উন্নয়নের কথা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা মুখে বলেন, বাস্তবে সেটা করতে হলে কিছু কাজ করা প্রয়োজন। এর জন্যে প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন। ক্রসফায়ার সাময়িক সমাধান হলেও সেটাকে সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে। জামায়াত-শিবির-জঙ্গিদের ক্রসফায়ারের বাইরে রেখে আইনশৃঙ্খলার উন্নতি করা যাবে না। জঙ্গি মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেটাকে আরো বেগবান করতে হবে। এটা করতে পারলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। উন্নতি হবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির। তখনই ঘটবে সত্যিকারের উন্নয়ন। সরকারকে চিৎকার করে সেটা বলতে হবে না, জনগণ এমনিতেই বুঝতে পারবে।

তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকার আপাতত দাতাদের আশ্বস্ত করতে পেরেছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিষয়টি কী হবে? ঘটনার কী এখানেই সমাপ্তি ঘটবে? নাকি জঙ্গি মৌলবাদ উচ্ছেদের কার্যকর ব্যবস্থা নেবে সরকার? যদি নেয় তাহলে সেটা দেশের জন্যে মঙ্গলজনক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেভাবে পাকিস্তানের ইমেজ অনেকটা ফিরিয়ে এনেছেন পারভেজ মোশাররফ

গালিব, বাংলা ভাই, আব্দুর রহমানরা কারো বন্ধু হতে পারে না। এরা দেশ এবং জনগণের শত্রু। জামায়াত-শিবির-ইসলামী ঐক্যজোটও একই কাতারের। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন ছিল আরো অনেক আগেই। ক্রিস্টিনা রোকা সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করছেন। কিন্তু সরকার যদি কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়, এই প্রশংসায় গদগদ হয়ে যায় তাহলে বাংলাদেশের ভাগ্যে বিপর্যয় অপেক্ষা করছে। একবার জঙ্গিদের অস্তিত্ব স্বীকার করে আর পিছিয়ে আসার সুযোগ নেই। এটা সরকারের নীতি নির্ধারকদের বুঝতে হবে।